'ঠাকুরমার ঝুলি'—আখ্যানের ভাষাছাঁদ

অভিজিৎ মজুমদার

১

'ঠাকুরমার ঝুলি'র সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ। বাঙালি সংস্কৃতির অন্তরমহলের গভীরে ছড়িয়ে রয়েছে এই গল্পবৃক্ষের শিকড়। আমাদের মনোভূমিতে তাই গল্পগুলি চিরনতুন, শাশ্বত। ১৯০৭ সালে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র আত্মপ্রকাশ। বঙ্গ ভঙ্গের স্বদেশী উন্মাদনা লেখককে নাড়া দিয়েছিল বলেই বোধহয় তাঁর গল্পে স্বদেশকে এত নিবিড় ভাবে পাওয়া যায়। একালের সমালোচক যথার্থই বলেন—'রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে চিনিয়েছিলেন কবিতায়-গানে-গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে-চিঠিপত্রে। দক্ষিণারঞ্জন চেনালেন রূপকথায়।'[১]

'ঠাকুরমার ঝুলি'র পরিচয় তার স্বপ্নসম্ভব কল্পনাশ্রয়ী গল্পকথায়। রূপকথার রাজ্যে এ গল্পমালার বিচরণ—যেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা ঘুচে যায়; অলৌকিকতাই হয়ে ওঠে গল্পের প্রাণভোমরা। রূপকথার গল্পের শুরু সাধারণত এক সংকটের মধ্যে; আর সমাপ্তি ঘটে সংকটের অবসানে। কাহিনির পরিণতি তাই শুভান্তক। অসামান্য গল্পরস, কাব্যময়তা আর চিত্রধর্ম গল্পগুলির আকর্ষণ। কিন্তু এ সত্ত্বেও দক্ষিণারঞ্জনের সব থেকে বড় কৃতিত্ব তাঁর গল্পকথনের অনন্য রীতি। এই অনায়াস দক্ষতার স্বীকৃতি মেলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে—'...দক্ষিণাবাবুকে ধন্য, তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন...' (দক্ষিণারঞ্জন কৃত গ্রন্থের ভূমিকা)।[২]

মনে রাখা দরকার, 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রকাশিত হবার আগেই উনিশ শতকে সংকলিত হয়েছিল উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। বলা বাহুল্য, এ সংকলনে রূপকথার আমেজ অনেকটাই ব্যাহত। কারণ লেখ্যরীতির প্রভাবে কথনের স্বাভাবিক ভঙ্গি সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অন্যদিকে ১৮৮৩ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র লোককথার সংকলন ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে—যার নাম 'Folk Tales of Bengal'। অনুবাদ স্বচ্ছন্দ হলেও ইংরেজি অনভিজ্ঞ এদেশী পাঠকের হৃদয়ে তা অধরাই থেকে গেছে।[৩] সেদিক থেকে ঠাকুরমার ঝুলির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ আগাগোড়া নিটোল বাঙলায় গল্প শুনিয়ে দক্ষিণারঞ্জন বাঙালির হৃদয়ে তাঁর স্থায়ী আসন পাকা করে নিয়েছেন।

২

বর্তমানে নিবন্ধের আলোচ্য 'ঠাকুরমার ঝুলি' আখ্যানের ভাষাছাঁদ। তবে এই আখ্যান (narrative) উপন্যাসের মতো কোনো সামগ্রিক আখ্যান নয়; ছোট-বড় মিশিয়ে মোট চোদ্দটি গল্পের সংকলন। এর মধ্যে তেরটি রূপকথা (fairy tale), একমাত্র ''শিয়াল

পণ্ডিত' গল্পটি পশুকথা (animal tale)। অবশ্য এর মধ্যে দুটি গল্প ('সুখু আর দুখু', 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী') ঠিক রূপকথা নয়, পশুকথা তো নয়-ই। সমগ্র আখ্যানকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন লেখক—(ক) দুধের সাগর; (খ) রূপ-তরাসী; (গ) চ্যাং-ব্যং; (ঘ) আম-সন্দেশ। এর মধ্যে (ঘ) অংশে কোনো গল্প নেই; কেবল ছড়া। (ক) অংশের গল্প ছ'টি, (খ) আর (গ) এর অন্তর্গত চারটি ক'রে গল্প।

আখ্যান বা ন্যারেটিভের সংজ্ঞা নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। আমরা এখানে বোঝাতে চাইছি, কথার সাহায্যে যে গল্প বলা হয় তা-ই আখ্যান।[৪] আঙ্গিকের দিক থেকে ছোটো গল্পের কাছাকাছি মনে হলেও আলোচ্য আখ্যান বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। 'সে/তিনি'র বয়ানে বলা এবং লেখা এসব গল্পে কোনোভাবেই 'আমি'র বয়ান প্রশ্রয় পায় না। অর্থাৎ যিনি গল্প শোনাচ্ছেন, তাঁকে যদি বলি কথক (narrator), তবে তাঁর সরাসরি কোনো প্রক্ষেপ পড়ে না আখ্যানের বয়ানে। অথচ তিনি হলেন সর্বজ্ঞ (omniscient); গল্পের ছোট-বড় সব চরিত্রের হাঁড়ির খবর তাঁর জানা। এধরনের গল্পের গ্রাহক (narrator) বা পাঠকও খানিকটা আলাদা। কথক/লেখক বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রা অতিক্রম করলেও গ্রাহককে তা মেনে নিতে হয়। অথচ সম্ভাব্যতার মাত্রা অতিক্রম করলে ছোটো গল্পে কিন্তু লেখককে খানিক যাচাই করে নেওয়ার প্রশ্ন থেকে যায়। তাছাড়া আখ্যানের একটি অঘোষিত শর্ত হল তার ফিক্‌শনধর্মিতা; কল্পনার খাদ মেশানো গল্পই আখ্যানের জন্য আদর্শ। জীবনী বা আত্মজীবনী সেকারণে ন্যারেটিভ নয়। এদিক থেকে বিচার করলে কল্পনার মাত্রা ছোটো গল্পের তুলনায় এখানে অনেক বেশি। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র আখ্যানধর্মিতায় সেজন্য কোনো সংশয় নেই।

৩

বিবরণ আর সংলাপের আঙ্গিক দিয়ে তৈরী হয় আখ্যানের গড়ন। আখ্যানের আলোচনায় সংলাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংলাপের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে নানা চরিত্রের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া; চরিত্রগুলির ভূমিকারও অদলবদল ঘটে। আখ্যানের নাটকীয়তাও তীব্র হয়ে ওঠে সংলাপেরই মাধ্যমেফল স্বরূপ কাহিনিতে দ্রুতির সঞ্চার ঘটে। ভাষাবিজ্ঞানী একারণেই বলেন, "The dramatic action is mainly performed through dialogues which iconically represent social encounters."।[৫] আখ্যানে সংলাপ যোজনার উদ্দেশ্য ত্রিবিধ—এক, আখ্যানের নান্দনিক নির্মাণের অন্যতম অবলম্বন সংলাপ। লেখক/কথক ও পাঠক/শ্রোতার যোগাযোগের অন্যতম সংকেত। দুই, পাঠক/শ্রেতা সংলাপের মাধ্যমে আখ্যানের মৌলিক উদ্দেশ্য, চরিত্রের তাৎপর্য এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। তিন সংলাপের প্রকৌশল আখ্যানের চরিত্রকে সামনে নিয়ে আসে। ফলে লেখক/কথক অন্তরালে থেকে যান; তাঁদের উপস্থিতি ঊহ্য থাকে। এঁদের নিজস্ব কণ্ঠস্বরও অশ্রুত থেকে যায়—"the direct authorial voice is eliminated"।[৬]

আলোচ্য আখ্যানের বিবরণ এবং সংলাপ, দু'য়ের ভাষাছাঁদই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আলোচনার গোড়ায় আমরা সংলাপ-অংশই বেছে নেব। বস্তুত, সংলাপধর্মের মধ্য দিয়েই কথকতার স্বাভাবিক ভঙ্গি গড়ে উঠেছে এই আখ্যানে। সংলাপের ভাষাছাঁদ সংক্রান্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে তুলে ধরতে পারি—

৪

লোককথার বয়ানের স্বাভাবিক ধর্ম হল, এখানে প্রাণ আর অপ্রাণের ভেদরেখা মুছে যায়। সংলাপে তাই অংশ নেয় একাধারে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী এবং অপ্রাণ বস্তু। বুদ্ধু বানর আর ভূতুম পেঁচার সংলাপ এখানে অসম্ভব কিছু নয় (কলাবতী রাজকন্যা, পৃ. ৩৪); তেমনি সম্ভব সুঁচের সবাক ভঙ্গিমা (কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা, পৃ. ৬৭) কিংবা মানুষ থেকে রূপান্তরিত চাঁপা ও পারুল ফুলের সহসা সংলাপী হয়ে ওঠা (সাত ভাই চম্পা, পৃ. ৭২-৭৩)। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় আখ্যানে তাই সংলাপীর সংখ্যাও বেড়ে যায়।

সংলাপের ভাষাও এখানে নজর করার মতো। অনেক গল্পে বিবৃতি-বাক্য ও সংলাপের গড়ন দুই-ই সাধু ভাষায়—

১. ক. সন্ন্যাসী...গাছের শিকড় দিয়া বলিলেন,—"এইটি বাটিয়া সাত রাণীতে খাইও, সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।" (কলাবতী রাজকন্যা, ৩০)

খ. ...ছোটবোন বলিল—"আমার যদি রাজার সঙ্গে বিয়ে হইত, তো আমি রাণী হইতাম!" (কিরণমালা, ৯৬)

অথচ একটু লক্ষ করলে দেখি, সাধুভাষায় এই প্যাটার্নে চলিত ভাষার একটা সূক্ষ্ম টোনও (tone) অনেক সময় সক্রিয় থাকে—

গ. মণিমালা বলিলেন, "মণি, মণি! উজ্‌লে ওঠ্‌, এই সরোবরের জলে আমি নাইব।" (পাতাল-কন্যা মণিমালা, ১৫২)

ঘ. রাণী বলিলেন, "কতদিন বোনদিগে দেখি না, 'মায়ের পেটের রক্তের পোম, আপন বলতে তিনটি বোন।'... (কিরণমালা, ৯৭)

উল্লেখ্য, সংলাপে চলতি ভাষার এই টোন অনেকটাই কথ্যভাষার কাছাকাছি হয়ে উঠেছে একেবারে শেষের দিকের 'শিয়াল পণ্ডিত'-এর মতো দু'-একটি গল্পে। এমনকি সংলাপ-পূর্ব বিবৃতি-বাক্যেও এই প্রভাব স্পষ্ট—

২. ক. —গোঁফ তিন চাড়া দিয়া দাঁত মুখ চাটিয়া চুটিয়া বলিতেছে,—"আহা বড় সাধুলোক ছিল গো!—কি হয়েছিল গো! কি করে গেল গো! —আচ্ছা, লোকটা যে মরিল তা'র লক্ষণ কি?" শিয়াল পণ্ডিত, ১৮১

খ. "—ওরে হতভাগা পাজী পাষণ্ডে' নাপতে!—দ্যাখ্‌তো—দ্যাখ্‌তো কি করেছিস্‌?"

দৃষ্টান্তগুলি থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না, সাধু আর চলিত বুলি (code) প্রয়োগের একটা দ্বন্দ্ব কাজ করছে আখ্যানের বয়ানে। ক্রিয়ারূপেও সেজন্য সাধু আর চলিত রূপের মিশেল।[৭] পশুকথা 'শিয়াল পণ্ডিত'-এর মতো গল্পে অবশ্য কথ্যভাষার সংলাপ বেশ মানানসই। কারণ, রূপকথার স্বপ্নরাজ্য ছেড়ে আখ্যান এখানে অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি। অবশ্য এধরনের প্রয়োগ লেখকের সচেতন কোনো উদ্যোগ কিনা, সেটা ভেবে দেখার।

বিবৃতি-বাক্য এবং সংলাপের প্রত্যাশিত প্যাটার্ন লেখক অনেকক্ষেত্রে ভেঙেও ফেলেন। তাই দেখি, কথনের স্বাভাবিক মেজাজ বজায় রাখতে গিয়ে প্রায়শই আখ্যানের বিবরণ অংশে সংলাপের প্রক্ষেপ ঘটে (এমনকি সংলাপ-পূর্ব বিবৃতি-বাক্যের অনুপস্থিতিতেও)। বলা বাহুল্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা স্বগতোক্তির মতোই। আবার অনেক-সময় চরিত্রের ভাবনাও প্রতিফলিত হয় সংলাপের আঙ্গিকে। দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে—

৩. ক. কলাবতী রাজকন্যা হীরাবতী রাজকন্যা ঘুমে। খু-ব রাত্রে হীরাবতী কলাবতী উঠিয়া দেখেন,—একি! হীরাবতীর ঘরে তো সোয়ামী নাই।...কি হইল, কি হইল? দেখেন,—বিছানার উপরে এক বানরের ছাল—অ্যাঁ-দ্যাখ্!—তবে তো এঁরা সত্যিকার. বানর না...—দুই বোনে ভাবেন। (কলাবতী রাজকন্যা, ৫০-৫১)।

খ. আবার দুপুরে রাজপুত্র শুইয়াছেন; মণিমালা মণি নিয়া উঠিয়া আসিলেন,—"ও বুড়ি বুড়ি, তুই কোথা' থেকে এলি? আমাকে একখানা শাড়ী বুনিয়া দে।" (পাতাল-কন্যা মণিমালা, ১৫৪)।

গ. পুরীর কানাচে কোণে যা', রাজভাণ্ডার ভরিয়াও তা নাই। "এসব এরা কোথায় পাইল?—এরা কি মানুষ!—হায়!!" একবার রাজা আনন্দে হাসেন, আবার রাজা দুঃখে ভাসেন...(কিরণমালা, ১১৪)

বস্তুত, এই সচেতন সংলাপধর্মী প্রক্ষেপ লেখককে অনায়াসে কথকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ করে দেয়।

আখ্যানে সংলাপের বিশিষ্ট প্রয়োগও লক্ষণীয়। চরিত্রানুসারী সংলাপ নির্মাণের উদ্যোগ বড় একটা নেই। রাজা-রাজপুত্র-রাণী এবং অন্য সব চরিত্র মোটামুটি একই ভাষায় কথা বলে। তবু এরই মাঝে নারী চরিত্রের সংলাপে অনেকক্ষেত্রেই কথ্যরীতিতে বোনা মেয়েলি ভাষার ছাপ দেখতে পাই। যেমন,

৪. ক. ...ন-রাণী আসিলেন। তিনি বলিলেন,—"ওমা; ওর জন্য কি তোরা কিছুই রাখিস্ নাই? কেমন লো তোরা! ..." (কলাবতী রাজকন্যা, ৩১)।

খ. রাণীরা সকলে কিল্ কিল্ করিয়া উঠিলেন—..."কে লো, কে লো, ঘুঁটে-কুড়ানীর ছা নাকি লো?" "ওমা, ওমা, ছি! ছি!" (তদেব, ৩৮)

গ. চোখ টানিয়া মুখ বাঁকাইয়া...সুখুর মা বলিল,—"বালাই! পরের কড়ির ভাগ-বাঁটরি—তার কপালে খ্যাংরা মারি!" (সুখু আর দুখু, ১৯২)

আরো দেখি, রাক্ষস-খোক্কসের সংলাপে নাসিক্যীভবনের সচেতন প্রয়োগ—

ঘ. খোক্কস...আর সকল খোক্কসকে বলিল,—"এইবাঁর জিঁভ টাঁনিয়া ছিঁড়িবঁ, তোঁরা আঁমাঁকে ধঁরিয়াঁ খুঁব জোঁরেঁ টাঁন্—ন্ঁ-ন্ঁ।" (নীলকমল আর লালকমল, ১২৭)

এরকমই বৈচিত্র্য তৈরী হয় সংলাপে ধ্বন্যাত্মক শব্দের অতিরেক ঘটিয়ে। অভিনব এইসব প্রকৌশল যে শিশুবিনোদনের উপকরণ হয়ে ওঠে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

ঙ. ছাদে রাক্ষসের হাট। একদিকে বলে—

হুঁম্ হুঁম্ খাম্—আঁরো খাঁবো।

আর দিকে বলে,—

গুম্ গুম্ গাঁম্—দেঁশে যাঁবো।

রাণী বলিল—

"গব্ গব্ গুম্, খম্ খম্ খাঃ
আমি হেঁথা থাকি, তোঁরা দেশে যাঃ!"

(নীলকমল আর লালকমল, ১২২)

সংলাপে নাসিক্য প্রয়োগ থেকে বোঝাই যায়, এ রাণী আসলে রাক্ষসী।

চরিত্রানুসারী সংলাপের আরো একটি বড় নমুনা হল চলিত ও কথ্যভাষার উপযুক্ত প্রয়োগ। আগেই বলেছি, গল্প যখন রূপকথা নয়, বাস্তব পৃথিবীর কাছাকাছি তখন চরিত্রের সংলাপে ধরা পড়ে চলিত ভাষা ও কথ্যধর্মিতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

৫. ক. ...ব্রাহ্মণী বলেন, —"চুপ্ কর্, চুপ্ কর...ওগো বাছারা, রাত গেল, তোমরা এখন বাড়ী যাও,—বামুন ঘুমুক।" (ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ২০৩)

খ. দেড় আঙ্গুলে' বলিল,—"না ভাই, আমি কোথায় পাব? বাড়ি নাই বলেই তো বাবাকে আনতে পারলেম না।" (দেড় আঙ্গুলে, ২১৩)

গ. মনে মনে সুখুর মা বিড্ বিড্—'শত্তুরের কপালে আগুন,—কেন আমার সুখু কি জলে ভাসা মেয়ে? দরদ দেখে মরে যাই!' (সুখু আর দুখু, ১৯২)

সংলাপের অভিনবত্ব মেলে 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পটিতেও। রাণী আর রাজকন্যার ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরের বুননে তৈরী হয় সংলাপের আঙ্গিক; যদিও প্রশ্নকর্তা আর উত্তরদাতা কে, তা অনুমান করে নিতে হয় প্রসঙ্গ (context) থেকে। লক্ষ করি, প্রশ্নের মধ্যে এক ধরনের সমান্তরাল বিন্যাস রয়েছে। অথচ সব প্রশ্নেরই উত্তর নেতিবাকে। সব প্রশ্নের একই উত্তর পেয়ে প্রশ্নকর্তা তাঁর অন্তিম সিদ্ধান্তে পৌঁছোন।

৬. রাণীরা বলিলেন—"রাজকন্যা, তুমি কা'র?"

রাজকন্যা বলিলেন—"ঢোল-ডগর যা'র।"

"ঢোল-ডগর হীরারাজপুত্রের?"

"না।"

"ঢোল-ডগর মাণিক রাজপুত্রের?"

"না।"

"ঢোল-ডগর মোতিরাজপুত্রের?"

"না।"

... রাণীরা বলিলেন—"তবে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

একেবারে সূচনায় করা প্রশ্নের উত্তর থেকে তৈরী হয় একাধিক সমান্ত. বাক্যাবিন্যাসে গড়া প্রশ্ন। প্রশ্নের ছাঁদে পাল্টে যায় কেবল ঢোল-ডগর অধিকারীর নাম। এধরনের বিকল্পন (substitution) সমান্তরালতার (parallelism) অন্যতম শর্ত পূরণ করে।

আরো লক্ষণীয়, অনুচ্ছেদের সূত্রপাত 'বিবৃতিবাক্য-সংলাপ'-এর ছাঁদে। দু'-পংক্তি বাদে শুধুই সংলাপ; বিবৃতিবাক্য অনুপস্থিত। হ্রস্বীকরণের চূড়ান্ত পরিণতি, সংলাপে একটিমাত্র 'না'-এর উপস্থিতি। একেবারে শেষে ফিরে আসে আবার 'বিবৃতিবাক্য-সংলাপ'-এর পূর্বোক্ত ছাঁচ। ফলে মিল-অমিলের একটা প্যাটার্ন তৈরী হয়। বলা বাহুল্য সমান্তরতার তা আবশ্যিক শর্ত—"in any parallelistic pattern there must be an element of identity and contrast"।[৮]

৫

সংলাপের অপর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ছড়ার ব্যবহার। ছড়ার অবিরল প্রয়োগ, বিশেষত, সংলাপে, 'ঠাকুরমার ঝুলি' আখ্যানের অন্যতম রীতি। ছড়াগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমিল, অর্থাৎ অন্ত্যমিল-যুক্ত। যেমন,

৭. ক. রাণীরা সকলে বলিলেন—"কোন্ দেশের রাজকন্যা কোন্ দেশে ঘর?/সোনার চাঁদ ছেলে আমার তো-মার বর।" (কলাবতী রাজকন্যা, ৩৬)

খ. যাইতে যাইতে সন্ন্যাসী বলেন,—"বিজন দেশের বিজন বনে কে গো বোন ভাই?—/কে গড়েছ, এমন পুরী, তুলনা তার নাই!" (কিরণমালা, ১০৫)

এজাতীয় ছড়ার আরো একটা বড় গুরুত্ব হল এদের প্রায়োগিক তাৎপর্য। আখ্যানে ছড়াগুলি আদৌ অসংলগ্ন নয়, বরং প্রায় ক্ষেত্রেই এদের কিছু নির্বাহী (functional) ভূমিকা থেকে যায়। কখনো তা তথ্যজ্ঞাপক (informative), কখনো আবার চরিত্রের অন্তর্নিহিত মনোভাবের দ্যোতক—

৮. ক. "উত্তর পূব, পূবের উত্তর/মায়া-পাহাড় আছে,
নিত্য ফলে সোনার ফল/সত্যি হীরার গাছে।" (অরুণ বরুণ কিরণমালা, ১০৭)

খ. "ভূতুম আমার বাপ!/কি করেছি পাপ?
কোন্ পাপে ছেড়ে গেলি, দিয়ে মনস্তাপ?" (কলাবতী রাজকন্যা, ৩৯)

ছড়াগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপের গ্রন্থন রচনায় এবং প্রশ্নোত্তরের ছাঁদ নির্মাণে—

৯. ক. ...শুক কয়,—"সারি,-সারি! বড় শীত!"
সারী বলে,—"গায়ের বসন টেনে দিস!"
শুক বলে,—"বসন গেল ছিঁড়ে, শীত গেল দূর,
কোন্‌খানে, সারি, ন-দীর কূল?"
সারী উত্তর করিল—" 'দুধ-মুকুটে' ধবল পাহাড় ক্ষীর-সাগরের পাড়ে,
গজমোতির রাঙা আলো ঝরঝরিয়ে পড়ে..."
শুক কহিল,—"সেই সোনার কমল, সেই গজমোতি
কে আনবে তুলে' কে পাবে রূপবতী!"
শুনিয়া বসন্ত বলিলেন,—'শুক-সারী মেসো মাসী
কি বল্‌ছিস বল্;
আমি আনবো গজমোতি
সোনার কমল।" (শীত বসন্ত, ৮৬)

গদ্য-সংলাপের মতোই ছড়ায় গাঁথা সংলাপেও নজরে পড়ে সাধু-চলিত বুলির বৈচিত্র্য। কখনো সাধু (১০ক), কখনো আগাগোড়া চলিতে (১০খ), আবার কখনো সাধু ও চলিত বুলির মিশ্রণে (১০গ) ছড়াশ্রয়ী সংলাপের নির্মাণ ঘটে—

১০. ক. "হাতের কাঁকন দিয়া কিনিলাম দাসী,/সেই হইল রাণী,
আমি হইলাম বাঁদী//" (কাঁকনমালা কাঞ্চনমালাা ৬৪)
খ. সন্ন্যাসী বলিলেন—"অরুণ বরুণ কিরণমালার রাঙা রাজপুরী/
দেখতে সুখ শুনতে সুখ, ফুটত আরো ছীরি।"
(কিরণমালা, ১০৫)
গ. ...কুঁচ-বরণ কন্যা উত্তর করিলেন,—"কলাবতী রাজকন্যা মেঘ-বরণ কেশ,/তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশ। আনতে পারে মোতির ফুল ঢো-ল ডগর,/ সেই পুত্রের বাঁদী হয়ে আসব তোমার ঘর।" (কলাবতী রাজকন্যা, ৩৬)

এও লক্ষ করি, 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র একেবারে শেষে 'চ্যাং-ব্যাং' অংশে ছড়ার সংলাপ গদ্যভাষার বেশ কাছাকাছি হয়ে উঠেছে—

১১. ক. দেড় আঙ্গুলে...—বলিল—"ও ভাই! সে বাড়ী যাস নি,/সে বাড়ী যাস নি,/সে বাড়ীতে আছে শাকচুন্নী; ঘাড়টি ভেঙ্গে রক্ত খাবে,/সাড়ে সাত গুষ্টি এক্কেবারে যাবে।" (দেড় আঙ্গুলে, ২১৮)
খ. ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"চুপ্ থাক্—এখন আমি চণ্ডীপূজো করে তবে এসে বলব ব'সে থাক্‌গে ওই দোরে।" (ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, ২০০)

প্রায়শই লোককথার ঘটনা-পরম্পরা নির্মাণেও ছড়ার প্রকৌশল ব্যবহার করা হয়। যেমন দেখি, 'সাত ভাই চম্পা' গল্পটিতে। রাজা ও রাণীদের ফুলগাছের কাছে এক এক ক'রে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত হয় ছড়ার অনুষঙ্গে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

১২. সাত চাঁপা...বলিতে লাগিল,—"না দিব, না দিব ফুল উঠিব শতেক দূর,/আগে আসুক রাজা, তবে দিব ফুল।"...

চাঁপারা বলিল,—"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,/আগে আসুক রাজার বড় রাণী, তবে দিব ফুল।...

চাঁপাফুলেরা বলিল—"না দিব, না দিব ফুল...আগে আসুক রাজার মেজরাণী, তবে দিব ফুল।" (সাত ভাই চম্পা, ৭১-৭২)।

লক্ষণীয়, পুনরুক্ত ছড়ার প্যাটার্নে বিকল্পনের মাধ্যমে একে একে একাধিক চরিত্রকে উপস্থিত ক'রে নাটকীয় উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করা হয়। রাজা/রাজার বড় রাণী/রাজার মেজ রাণী...এইভাবে বিকল্পন চলতেই থাকে।

পরিণতিতে ফুলেদের আবদার যখন এমন জায়গায় পৌঁছয়—'...যদি আসে রাজার ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী,/তবে দিব ফুল", তখন অন্তিম বিকল্পনের মধ্য দিয়ে কাহিনি তার সার্থক পরিণতি পায়।

বস্তুত, এই বিকল্পনের মাধ্যমে বৈপরীত্যের ক্ষেত্রটিও তৈরী হয়ে যায়। 'রাণী' থেকে সহসা 'দাসী'তে অবনমনের ফলে যে সামাজিক শ্রেণীগত বিপ্রতীপতার (contrast) সৃষ্টি হয়, শ্রোতা/পাঠককে চমকিত করার জন্য তা যথেষ্ট।

বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে নিরর্থক ধ্বন্যাত্মক পদের ব্যবহার করেও ছড়াকে শিশুবিনোদনের উপকরণ করে তোলা হয়—

১৩. ক. টিং টিঙা টিং টিঙা। কাটবি কি তুই ঝিঙা।
নাকও নাই, কানও নাই, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্ ঘিঙা। (দেড় আঙুলে, ২১২)

খ. "করম্ খাম্ গরম খাম্
মুড়মুড়িয়ে হাড্ডি খাম্!
হম্ ধম্ ধম্ চিতার আগুন
তবে বুকের জ্বালা যাম্!!" (নীলকমল আর লালকমল, ১৩৫)

৬

সংলাপ ছাড়া আখ্যানের অপর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বিবরণ (narration)। এবার বিবরণের ভাষাছাঁদ সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর করতে পারি।

প্রথমেই দেখি, বাক্যের প্যাটার্নে সমান্তরতা (parallelism)। সমান্তরতা বলতে বুঝি, "...সমগঠনের বা প্রায় সমগঠনের যে কোনো আন্বয়িক উপাদানের বারবার ব্যবহার এবং

তারই ফলে একটি সৌষম্যের সৃষ্টি। শুধু একটি বাক্যের মধ্যে নয়, বাক্যের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র অনুচ্ছেদের মধ্যে এক ধরনের আন্বয়িক উপাদানের আবর্তনে সৃষ্টি হয় একটি বিশেষ সংগীত এবং সমগ্র অংশের মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য"।[৯]

আলোচ্য আখ্যানে, বিশেষত রূপকথার গল্পগুলিতে, লক্ষ করা যায় বাক্যিক সমান্তরতা (syntactic parallelism)। প্রকৃতপক্ষে, রূপকথায় মানানসই গতিশীল চিত্রধর্ম এবং ডিটেলিং-এর প্রয়োজনে এজাতীয় প্রকৌশল কার্যকরী হয়ে ওঠে। ছোট ছোট বিবৃতিমূলক সমাপিকা ক্রিয়াশ্রয়ী বাক্যে, সমান্তর প্রয়োগ একধরনের প্রবহমাণ বাক্যিক শৃঙ্খল তৈরী করে দেয়; ফলে গদ্যের ছাঁদে সৃষ্টি হয় এক ছন্দোময়তা। সম্ভবত, এই কারণেই রূপকথার আখ্যানসমূহ পঠনের থেকেও শ্রুতির উপযোগী হয়ে ওঠে।

১৪. ক. ...বড়রাণী ভাত রাঁধিবেন, মেজরাণী, তরকারি কাটিবেন, সেজরাণী ব্যঞ্জন রাঁধিবেন... (কলাবতী রাজকন্যা, ৩০)

খ. ...অরুণ বরুণ কিরণমালা কাজললতাকে ঘাস জল দিলেন, ... বাছুর খুলিয়া দিলেন, হরিণছানা নাওয়াইয়া দিলেন... (কিরণমালা, ১১৩)

একাধিক চরিত্রের বিবিধ কর্মকাণ্ড এখানে বর্ণিত হয় দীর্ঘ সমান্তরাল বাক্যবিন্যাসের ধারাবাহিকতায়। প্রথম দৃষ্টান্তে প্রতি বাক্যের কর্তা স্বতন্ত্র। যদিও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে কর্তা হিসেবে তিনটি চরিত্র একজোট। একই বাক্যের বিবরণ এখানে বিস্তারিত হয় বিভিন্ন অঙ্গবাক্যের (clause) গ্রন্থনে। দুটি ক্ষেত্রেই ক্রিয়া-পরম্পরা নির্দিষ্ট কালসূচক—প্রথমটিতে ভবিষ্যৎকাল আর অন্যটিতে সামান্য অতীত (immediate past)।

সমান্তরতার অন্য ধরনের প্রয়োগ নীচের দৃষ্টান্ত—

১৪. গ. (i) বনে প'খ-পাখালীর শব্দ নাই, বাঘ ভালুকের সাড়া নাই!

(ii) ...ফটকের চূড়ায় বাদ্য বাজে না, ফটকের দুয়ারে দুয়ারী নাই।

(iii) ...পুরীর মধ্যে জন-মানুষ নাই,...সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না...পাতাটি পড়ে না, কূটাটুকু নড়ে না।

(iv) ...কেহ কথা কহিল না, কেহ...ফিরিয়া দেখিল না। ...(ঘুমন্ত পুরী, ৫৪)

এক নিস্তব্ধ ঘুমন্ত পুরীর নির্জনতা এখানে স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ওঠে, একাধিক অনুচ্ছেদ-পরম্পরায় ব্যবহৃত সমান্তরাল নেতিবাক্যের মাধ্যমে। বলতে পারি, আখ্যানের ভাষাছাঁদে নেতিবাক্যের প্রমুখণ (foregrounding) ঘটে।[১০]

বস্তুতপক্ষে, এধরনের সমান্তরাল প্রয়োগ মারফৎ এক ধরনের অধিবাচনিক প্রকৌশলও (discourse stratgegy) সাধিত হয়। একই ধরনের আন্বয়িক বিন্যাসের আবর্তনে বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মধ্যে তৈরী হয় এক সামগ্রিক ঐক্য। রচনায় ভাব ও ভাষার সংহতি নির্মাণের প্রয়োজনে ভাষিক সংলগ্নতার এই প্রযুক্তি অবশ্যই তাৎপর্যবহ।

পুনরুক্ত প্যাটার্নের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মধ্যে সংলগ্নতা নির্মাণের প্রয়াস উপরোক্ত

গল্পটির অন্যত্রও[১১] লক্ষ করি—রাজপুরীর বিভিন্ন কক্ষে রাজপুত্র যা যা দেখেন, তা বর্ণিত হয় একাধিক অনুচ্ছেদে। কিন্তু এই অনুচ্ছেদগুলিকে গ্রথিত করা হয় একই ধরনের বাক্য দিয়ে—

১৪. ঘ. (i) এক কুঠরীতে গিয়া দেখেন...

(ii) আর এক কুঠরীতে গিয়া দেখেন...

(iii) ...রাজপুত্র দেখেন...

(iv) আর এক কুঠরীতে গিয়া দেখেন... (তদেব, ৫৫)

ক্রিয়াশ্রয়ী বাক্যের প্যাটার্ন হল আখ্যানের ভাষাছাঁদের একটি অন্যতম লক্ষণ। যেমন দেখা যায়, একই বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার পরম্পরা। চরিত্রের বিবিধ কর্মকাণ্ডের যাবতীয় খুঁটিনাটি বর্ণিত হয় ক্রিয়াগুলির পরম্পরিত বিন্যাসের মাধ্যমে। ১৪(ক-খ)-এ বিবৃত প্যাটার্নের বিপরীতধর্মী এই বিন্যাস। আলাদা আলাদা বাক্য বা খণ্ডবাক্যে নয়, একই বাক্যের ছাঁদে চরিত্রের ক্রিয়াকাণ্ডের ডিটেলিং পাওয়া যায়—

১৫. ক. রাজপুত্রেরা চুপি চুপি আসিয়া কৌটাটি সরাইয়া লইয়া,...বুদ্ধুকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। (কলাবতী রাজকন্যা, ৪৭)

খ. ...স্নান-টান করিয়া, কাপড়চোপড় ছাড়িয়া...ফুল-বেলপাতা অঞ্জলি দিয়া, রাজপুত্র নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তালগাছে উঠিয়া তালপত্র খাঁড়া ক্রমিক পড়িলেন। (সোনার কাটি রূপার কাটি, ১৭১)

প্রতিটি অসমাপিকা ক্রিয়ার আবির্ভাব পাঠক/শ্রোতার উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তোলে; আর সেই উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি যেন ঘটে বাক্যের শেষে সমাপিকা ক্রিয়ায় পৌঁছে।

ক্রিয়ার পুনরুক্তি আরেক শৈলীগত প্রকৌশল। বিভিন্ন বাক্যে একই সমাপিকা ক্রিয়ার পুনরাবর্তন তৈরী করে বাক্যের শৃঙ্খল। অনেকক্ষেত্রে বাক্যিক সংলগ্নতার পাশাপাশি দুটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদকেও তা সম্পর্কিত করে তোলে।

১৬. ক. দুয়োরাণী শিকড়...বড়রাণীর কাছে দিলেন। বড়রাণী...মেজরানীর হাতে দিলেন। মেজরাণী...সেজরাণীকে দিলেন। সেজরাণী...কনে রাণীকে দিলেন... (কলাবতী রাজকন্যা, ৩০)

খ. রাজদরবারে রাজা জাগিলেন, মন্ত্রী জাগিলেন, পাত্র জাগিলেন... (ঘুমন্ত পুরী, ৫৯)

গ. মেজ-রাণী আসিলেন, সেজ-রাণী আসিলেন, ন-রাণী আসিলেন, কনে-রাণী আসিলেন, কেহই ফুল পাইলেন না। (সাত ভাই চম্পা, ৭২)

(১৬ক)-এ শিকড় হস্তান্তরের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চিহ্নিত হয় ক্রিয়ার পুনরাবর্তন মারফৎ। (খ) দৃষ্টান্তে ক্রিয়ার পুনরুক্তি ঘুমন্ত পুরীতে জাগরণের ছবিটিকেই যেন মূর্ত করে তোলে। চরিত্রগুলি একে একে ঘুম ভেঙে সজাগ হয়ে উঠতে থাকে। (১৬গ)-এ সমাপিকা ক্রিয়ার পুনরাবর্তন মারফৎ একাধিক চরিত্রের ক্রমিক আগমন, ফুলপ্রাপ্তির যে জোরালো প্রত্যাশা

তৈরী করে, কেবলমাত্র একটি নেতিবাক্যের উপস্থিতিতে তা হতাশায় পরিণতি পায়। পুনরাবর্তনের প্রত্যাশিত প্যাটার্ন ভেঙে দিয়ে আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যাশাভঙ্গের বৈপরীত্য গড়ে তোলা হয় বাক্যের বুনোটে।

অবশ্য শুধু বাক্য নয়, স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদও সংযুক্ত হতে পারে ক্রিয়ার পুনরুক্তির সাহায্যে, যেমন,

১৬. ঘ. (i) ...রাজকন্যা এক কুঠরীর মধ্যে আটক হইয়া রহিলেন।

(ii) + রহিলেন—ময়ূরপঙ্খী আসিয়া ঘাটে লাগিল... (কলাবতী রাজকন্যা, ৪৮)

['+' চিহ্ন এখানে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ সূচনার দ্যোতক।]

পুনরুক্তির এই প্রবণতা দেখতে পাই অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও। প্রত্যাশিত গতিধর্মের যেন দ্যোতক হয়ে ওঠে এধরনের প্রয়োগ। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

১৭. ক. যাইতে, যাইতে, যাইতে বসন্ত কত পর্বত, কত বন, কত দেশ-বিদেশ ছাড়াইয়া...ধবল পাহাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন। (শীত বসন্ত, ৮৭)

খ. ঘোড়া ছুটাইতে ছুটাইতে ছুটাইতে ছুটাইতে, চার বন্ধু এক তেপান্তরের মাঠের সীমায় আসিয়া পৌছিলেন। (সোনার কাটি রূপার কাটি, ১৬০)

গ. যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে, কত দেশ, কত পর্বত, কত নদী, কত রাজার রাজ্য ছাড়াইয়া রাজপুত্র এক বনের মধ্যে উপস্থিত হলেন। (ঘুমন্ত পুরী, ৫৪)

ঘ. দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে কত বচ্ছর চলিয়া গেল। (তদেব, ৫৬)

লক্ষ করি, ১৭(ক, গ) দৃষ্টান্তে অসমাপিকা ক্রিয়ার পুনরুক্তির পাশাপাশি বিশেষ্য পদগুচ্ছের পুনরাবর্তনের (কত পর্বত, কত বন...ইত্যাদি) মধ্য দিয়ে একইসঙ্গে স্থান ও কালের বিস্তার যেন ঘটে চলে। বস্তুত, এই প্রবহমাণতাই আখ্যানের ভাষাছাঁদে প্রতিফলিত হয়। পুনরাবৃত্তির এই প্রবণতা একই বাক্যে যুগপৎ সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারেও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে—

ঙ. চাহিয়া চাহিয়া, দেখিয়া দেখিয়া, শেষে চক্ষের জল পড়ে-পড়ে। (কিরণমালা, ১০২)

আখ্যানের গদ্যরীতির আরেক বিশেষত্ব হল, একই ক্রিয়ার সমাপিকা ও অসমাপিকা রূপের যুগপৎ প্রয়োগের মাধ্যমে বাক্যের শৃঙ্খল তৈরী। হতে থাকে বয়ানে প্রায়শই এই প্রকৌশলের ব্যবহার দুটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদকে সংলগ্ন করে তুলেছে—

১৮. ক. রাজা আবার ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন...

নিষ্ঠুর বড়রাণীরা...ছেলেমেয়েগুলিকে...পুঁতিয়া ফেলিয়া আসিল। আসিয়া, তাহার পর শিকল ধরিয়া টান দিল। (সাত ভাই চম্পা, ৭০)

খ. রাজপুত্রেরা...ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া আসিল। আসিয়া দেখে বুদ্ধু আর ভুতুম! ...

রাজপুত্র...বাহির হইয়া আসিল। আসিয়া, সকলে...পাল তুলিয়া দিল। (বুদ্ধু ভুতুম, ৪১)

গ. রাজপুত্র...অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

+ দেখিতে দেখিতে...কত বচ্ছর চলিয়া গেল।

...রাজপুত্র...দেখিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে...রাজকন্যার মাথায় ছুঁইয়া গেল! (ঘুমন্তপুরী, ৫৬) [অনুচ্ছেদসংযুক্ত]

ঘ. ...রাজপুত্র চলিতে লাগিলেন।

চলিতে চলিতে...রাজপুত্র দেখেন... (ঘুমন্তপুরী, ৫৪) [অনুচ্ছেদ সংযুক্ত]

ঙ. ...দুই বন্ধু সরোবরে নামিলেন।

+ নামিতে নামিতে দুই বন্ধু যতদূর যান... (পাতাল কন্যা মণিমালা, ১৫০)

অধিবাচনিক নির্মাণে সংযোজকেরও (connective) একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। কারণ অধিবাচনের যৌক্তিক অবয়ব নির্মাণে সংযোজক সাহায্য করে—"a device for marking logical relationships in a discourse"[১২]। সংযোজক অধিবাচনের কোনো নির্দিষ্ট অংশকে তার পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে। ফলে পাঠকের অনুধাবনে তা সহায়ক হয়ে ওঠে। চ্যাপম্যান এজন্যই বলেন—"understanding depends on overt or concealed reference to the precedent"।[১৩] সংযোজক এক্ষেত্রে মূর্ত নির্দেশকের ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমান আখ্যানে সংযোজকের বৈচিত্র্য বড় একটা নেই। ঘটনার পরম্পরা চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ এক ধরনের সংযোজক বা সংযোজক পদগুচ্ছ (হ্যালিডে-হাসানের শ্রেণীকরণ অনুযায়ী[১৪] additive conjunction) এখানে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়—

১৯. ক. তার পর-বছর রাণীর আবার ছেলে হইবে।

...তার পরের বছর রাণীর এক মেয়ে হইল।

...তার পরের বছর...ব্রাহ্মণের ঘাটে আসিল। (কিরণমালা, ৯৮-১০০)

খ. তাহার পর আর কি? আনন্দের হাট বসিল।

...তাহার পর আর একদিন, রাজ্যের কতকগুলো জল্লাদ...

দুই বোনকে...পুঁতিয়া ফেলিয়া চলিয়া আসিল।

—তাহার পর রাজা, রাণী...রাজত্ব করিতে লাগিলেন। (কিরণমালা, ১১৬)

গ. পরদিন, সেই যে ঢোল ডগর ছিল?...

তাহার পরদিন...গাছের পাতায় পাতায় ফল ধরিয়াছে! ...

তাহার পরদিন...লক্ষ সিপাই পাহারা দিতেছে! (কলাবতী রাজকন্যা, ৪৯)

ঘ. তাহার পর...বসন্ত...ফুলের মধু খায়। ...

তাহার পর...বসন্ত...কত মন্ত্রের কথা এইসব শোনে। (শীতবসন্ত, ৮১)

ধ্বন্যাত্মক শব্দের (onomatopoetic forms) প্রয়োগপ্রাচুর্য আখ্যানের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। ধ্বনির সঙ্গে অনুভূতির প্রগাঢ় মেলবন্ধন ঘটে যায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের আশ্রয়ে।

ফলত, পাঠকের মনোভূমিতে শ্রুতির অতীত এক সংবেদনের সৃষ্টি হয়। সাধারণ শব্দের ক্ষেত্রে ধ্বনি আর অর্থের মধ্যবর্তী একটি অনুধাবনের স্তর সক্রিয় থাকে। কিন্তু ধ্বন্যাত্মক শব্দের নির্মাণের ক্ষেত্রে ধ্বনি আর অর্থের মাঝে অনুধাবনের এই স্তর ততটা সক্রিয় থাকে না। ধ্বনিই প্রধান উদ্দীপক হয়ে উঠে পাঠকের চেতনায় অনুভূতির স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। ব্লুমফিল্ড যে কারণে বলেন, "Symbolic forms have a connotation of somehow illustrating the meaning more immediately than do ordinary speech forms."।[১৫] এই আখ্যানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ একদিকে যেমন ধ্বনির সংগীত, তেমনি ধ্বনিচিত্রও বটে। কারণ অনেকক্ষেত্রেই তা সৃষ্টি করে এক অদৃশ্য ধ্বনি-আশ্রয়ী বাক্‌প্রতিমা (phono-aesthetic)। নীচের দৃষ্টান্তগুলি দেখা যেতে পারে—

২০. ক. সূতাশঙ্খ...আগুন ছুটাইয়া লক্‌লক্ করিয়া উঠিয়াছে;—রাজপুত্রের তরোয়াল ঝ—ঝন্—ঝন্ শব্দে...বত্রিশ ফণায় গিয়া লাগিল! ...—রাজপুত্র শন্‌শন্ তরোয়াল ঘুরাইয়া বলিলেন:...পুরীতে ধ-ধ্বড়্ ধ্বড়্ শব্দে হাজার সিঁড়ির ধাপ ধ্বসিয়া গেল...ভূমিকম্প—গুড়্‌গুড়্ দুড়্ দুড়্ শব্দ... (ডালিম কুমার, ১৪৪)

খ. ...কলকল শব্দে রক্তনদীর জল তোড়ে ছুটিয়াছে; ...হাড়ে হাড়ে কটাকট খটাখট শব্দ...পায়ের নীচে হাড়ের পাহাড় খট্-খট্-খটাং, ছর্-র্-র্-র্—ছট্‌ছট্ শব্দে তুষ হইয়া গেল। (তদেব, ১৪৫)

গ. মন্ত্রিপুত্র...সর্‌সর্ করিয়া গাছে উঠিয়া গেলেন!....অজগর, হোঁস্ হোঁস্ শোঁস্ শোঁস্ শব্দে ছুটিয়া আসিল...তরোয়ালের উপর ফটাফট ছোবল মারিতে লাগিল। (পাতাল-কন্যা মণিমালা, ১৫০)

ঘ. তর্ তর্ করিয়া হীরার গাছ বড় হইল, ফর্ ফর্ করিয়া রূপার গাছ পাতা মেলিল, ...শীতল ঝরণায় মুক্তার জল ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিতে লাগিল। (কিরণমালা, ১১৩)

বোঝা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এধরনের শব্দদ্বৈতগুলি ধ্বনির যথার্থ অনুকরণ; পাঠকের শ্রুতির সঙ্গে যা প্রায় প্রত্যক্ষ সম্পর্কান্বিত। এরকম অনুকারক প্রয়োগ ভাষাবিজ্ঞানে প্রাথমিক ধ্বনিবৃত্তি (primary onomatopoeia) নামে পরিচিত। সমগ্র আখ্যানে ধ্বনির এই তীব্র অনুনাদ সৃষ্টি করে এক অনিবার্য গতিময়তা। আখ্যানের বিবরণেও একটা সংহত প্যাটার্নের সৃষ্টি হয়।

ধ্বন্যাত্মক প্রয়োগের কিছু অভিনবত্বও রয়েছে। যেমন, বিশেষণীয় প্রয়োগে—

২১. ক. টুকটুকে মেয়ে, টুলটুলে মুখ, হাত-পা যেন ফুল-তুক্‌তুক্। (কিরণমালা, ৯৯)

খ. রাক্ষসী গিয়া নিশ্চিন্তে দুধ-ধব্‌ধব্ শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। (ডালিম কুমার, ১৩৯)

গ. রাজপুরীর চার-চত্বর দল্‌দল্ ঝল্‌মল্ (ঘুমন্ত পুরী, ৬০)

ঘ. শ্বেত পাথর ধব্ ধব্, শ্বেত মাণিক রব্ রব্;
...মধুর গন্ধে অট্টালিকা ভুর্‌ভুর্ (কিরণমালা, ১০৫)

এসব ক্ষেত্রে দেখি, বিশেষণীয় পদের অবস্থান বিশেষ্যের পরে। আরো লক্ষণীয়, শব্দদ্বৈত ও এজাতীয় দৃষ্টান্তে গৌণ ধ্বনিবৃত্তির (secondary onomatopoeia) সাক্ষ্য বহন করে। কারণ অনুকারক প্রয়োগ এক্ষেত্রে ধ্বনির যথার্থ অনুকরণ নয়; বরং ভাবের প্রকাশক।

ধ্বন্যাত্মক পদের আরও ব্যবহার দেখি সমিল প্রয়োগে কিংবা অর্থহীন ছড়ায় (২২ঘ)। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

২২. ক.হীরামোতি হেলে না, মাটিতে পা ফেলে না,
সকল পুরী গমগমা; সকল রাজ্য রমরমা। (কিরণমালা, ৯৮)

খ. রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ, দিক দিশা খাঁ খাঁ...
রাজার বুক ধুকু ধুকু, রাজার বুক উসু খুসু... (তদেব, ১০২)

গ. কান নড়বে পটাপট/লেজ পড়বে চটাচট (শিয়াল পণ্ডিত, ১৮১)

ঘ. সব্ সব গুম্, খম্ খম্ খাঃ!
আমি হেঁথা থাকি, তোঁরা দেশে যাঃ! (নীলকমল আর লালকমল, ১২২)

ধ্বন্যাত্মক পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ ও লক্ষ করার মতো—

২৩. ক. ...চাঁদের কিরণ মুখখানি...টুলটুল্ করিতেছে। (ঘুমন্ত পুরী, ৫৬)

খ. রাণীরা সকলে কিলকিল করিয়া উঠিলেন। (কলাবতী রাজকন্যা, ৩৮)

গ. হাত পা যেন ফুল-তুক্‌তুক্ (কিরণমালা, ৯৯)

ঘ. মুক্তার ফল থরে থরে চম্-চম্ (কিরণমালা, ১১৩)

আখ্যানের আরো দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে এ প্রবন্ধের দাঁড়ি টানবো। অবশ্য এ লক্ষণ দুটি বয়ানে বহুব্যবহৃত নয়; বরং স্বল্পমাত্রায় প্রযুক্ত। 'ঠাকুরমার ঝুলি' আখ্যানটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর গতিশীল চিত্রধর্মিতা। এই গতিময়তাকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য কখনো ব্যবহৃত হয় অসমাপিকা ক্রিয়া-বহুল দীর্ঘ বাক্যবিন্যাস, কখনো বা পুনরুক্ত ক্রিয়ার বন্ধনে গ্রথিত বাক্যিক শৃঙ্খল, কখনো আবার একাধিক বিশেষ্যগুচ্ছের পরম্পরা। যেমন,

২৪. ক. ক্ষেতের ধান, গাছের ফল, কলস কলস গঙ্গাজল, ডোল-ভরা মুগ, কাজললতা গাইয়ের দুধ—ব্রাহ্মণের টাকা পেঁটরায় ধরে না। (কিরণমালা, ১০০)

খ. কান্নাকাটি, চীৎকার, হাহাকার, বুকে চাপড়, ছুটাছুটি। (ডালিমকুমার, ১৪১)

গ. ধূমধাম, অভিষেক, জাঁকজমক, বিচার, আচার, সভা দরবার—সব শেষে...সব ঘুমাইয়াছে। (তদেব, ১৪২)

একাধিক বিশেষ্যগুচ্ছের ভারে আঁটোসাঁটো বাক্যে তৈরী হয়ে যায় ছোটো ছোটো খণ্ডচিত্রের বর্ণময় কোলাজ।

দ্বিতীয়ত, সংখ্যাসূচকের ব্যবহার লোককথার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১৬] এই আখ্যানের সব গুলি গল্প না হলেও বেশ কয়েকটি গল্পে চরিত্র এবং সপ্রাণ ও অপ্রাণ বস্তুকে সংখ্যাসূচকে বিশেষিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত, রূপকথার গল্পের সূচনায় চরিত্রগুলিকে সংখ্যাসূচকে চিহ্নিত করার একটা সাধারণ লক্ষণ দেখতে পাই। যেমন,

২৫. ক. এক যে, রাজা। রাজার সাত রাণী। (কলাবতী রাজকন্যা, ২৯)

খ. এক রাজা, রাজার এক রাণী, এক রাজপুত্র (ডালিম কুমার, ১৩৭)

গ. এক রাজপুত্র আর এক রাখাল, দুই জনে বন্ধু (কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা, ৬১)

শুধু গল্পের সূচনায় নয়, গল্পের বয়ানেও একই প্রবণতা—

২৬. ক. দশ মাস দশ দিন যায়, পাঁচ রাণীর পাঁচ ছেলে হইল
...পাঁচ রাজপুত্র পাঁচটি পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়।

(কলাবতী রাজকন্যা, ৩২)

খ. তিন বুড়ীর তিন বুড়া পাইক আসিয়া নৌকা আটকাইল।...
তিন বুড়ী তিন সন্ধ্যা জল খাইয়া, নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

(তদেব, ৪১)

গ. ...দুইজনে দুইখানা সুপারীর ডোঙ্গায়, দুইকড়া কড়ি,
ধান দূর্বা...সিন্দূরের ফোঁটা দিয়ে ভাসাইয়া দিলেন।

(তদেব, ৩৯)

ঘ. ...চারিজনে চারি ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। ...চার দিকে চার পথ।
...চার ঘোড়া চার পথে ছুটিল। (সোনার কাটি রূপার কাটি, ১৬০)

ঙ. বার বচ্ছর তের দিনে...ধবল পাহাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন।
...সাত দিন সাত রাত্রি না গেলে তো দুয়ার খুলিবে না।
...তিন সোনার মাছ তিন রাজপুত্র হইয়া, শীত বসন্তের পায়ে প্রণাম করিয়া বলিল...

(শীত বসন্ত ৮৭, ৯০, ৯১)

কথাশেষ

বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল, 'ঠাকুরমার ঝুলি' আখ্যানের ভাষাশৈলীগত বিচার। সংলাপ আর বিবরণের বুনোটে গড়ে ওঠে আখ্যানের শরীর। সংলাপ আখ্যানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ; বিশেষত লোককথা-ধর্মী আখ্যানে। কারণ সপ্রাণ এবং অপ্রাণ জগৎ দুই-ই এখানে সংলাপী। ঠাকুরমার ঝুলির সংলাপ সাধু ভাষায়, যদিও সাধু আর চলিত বুলির দ্বন্দ্ব আখ্যানের অন্যতম লক্ষণ। আরো দেখি, এই চলিত বুলিই পশুকথার গল্পে অনেক সময় কথ্য ভাষার কাছাকাছি হয়ে উঠেছে। আখ্যানের আরেকটি অন্যতম লক্ষণ হল সচেতন সংলাপধর্মী প্রক্ষেপ; প্রায়শই যা বিবরণধর্মী অংশকে সংলাপের আদলে গড়ে তোলে, কখনো আবার চরিত্রের অন্তর্গত ভাবনাকে সংলাপের রূপ দেয়। সংলাপকে চরিত্রানুসারী করে গড়ে তোলার একটা প্রয়াসও লক্ষ করা যায় আখ্যানে। নারী চরিত্রের সংলাপে তাই কথ্যরীতিতে বোনা মেয়েলি সংলাপের ছাপ, রাক্ষস-খোক্কসের সংলাপে সচেতন নাসিক্যীভবন। না-রূপকথার গল্পগুলিতে চলিত ও কথ্যভাষার প্রয়োগ চরিত্রানুগ সংলাপ নির্মাণের সার্থক দৃষ্টান্ত। লক্ষ

করি, সমান্তরতা, বিকল্পন প্রভৃতি প্রকৌশলের প্রয়োগ সংলাপের গ্রন্থনে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

সংলাপের অপর একটি লক্ষণ হল ছড়ার ব্যবহার। ছড়ায় গাথা সংলাপ প্রায়ক্ষেত্রেই সমিল; সাধু এবং চলিত বুলির মিশ্রণ, কখনো আবার তা গদ্যভাষার বেশ কাছাকাছি। আখ্যানে ছড়াগুলির নির্বাহী ভূমিকা থেকে যায়—কখনো তা তথ্যজ্ঞাপক, কখনো চরিত্রের অন্তর্নিহিত মনোভাবের দ্যোতক। অনেকক্ষেত্রে ঘটনা-পরম্পরার নির্মাণে বা নাটকীয় উৎকণ্ঠার সৃষ্টিতে ছড়ার সুনির্দিষ্ট প্রকৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুনরুক্তির পাশাপাশি বিকল্পন ও বৈপরীত্য প্রভৃতি প্রযুক্তির ব্যবহার ছড়ার আঙ্গিকে প্রায়শই তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে।

আখ্যানের অপর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বিবরণ। বাক্যের বিন্যাসে সমান্তরতা বিবরণধর্মী অংশের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। আখ্যানের গতিশীল চিত্রধর্ম এবং অনুপুঙ্খ বিবরণের প্রয়োজনে তা মানানসই হয়ে ওঠে। সমান্তরাল বাক্যে গড়া গদ্যের ছাঁদেও সৃষ্টি হয় শ্রুতিসুখকর ছন্দোময়তা। বাক্যের গড়নে সমান্তরাল প্রয়োগ একধরনের অধিবাচনিক প্রকৌশলও বটে। সমান্তর গঠনের পুনরুক্তি রচনার ভাব ও ভাষার মধ্যে সংহতি নির্মাণ করে; ফলে বিভিন্ন অনুচ্ছেদগুলি হয়ে ওঠে পরস্পর-সংলগ্ন। এর পাশাপাশি ক্রিয়াশ্রয়ী বাক্যের প্যাটার্নে ক্রিয়ার পুনরুক্তি, সমাপিকা অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন শৈলীগত প্রযুক্তি বয়ানের ভাষাছাঁদের সংলগ্নতা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরকমই গুরুত্ববহ লক্ষণ হল সংযোজক এবং সংখ্যাসূচকের ব্যবহার।

পরিশেষে বলতে হয়, আখ্যানে ধ্বন্যাত্মক পদব্যবহারের প্রয়োগশৈলীর কথা। আলোচ্য আখ্যানে ধ্বন্যাত্মক পদের সংযোজন যেমন ধ্বনির সংগীত সৃষ্টি করে, তেমনি ধ্বনিচিত্রের নির্মাণে তা অন্যতম সহায়ক হয়ে ওঠে। উপরন্তু সমগ্র আখ্যানে ধ্বনির তীব্র অনুনাদ সৃষ্টি করে এক অনিবার্য ও নিরন্তর গতিময়তা।

সূত্রনির্দেশ :

১. মানস মজুমদার (২০১০) : 'শতবর্ষে ঠাকুরমার ঝুলি'; অন্তর্গত : লোকঐতিহ্য চর্চা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১০৯।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৭) : ভূমিকাংশ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (সম্পা.), ঠাকুরমার ঝুলি, পৃ. ১১।

৩. অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে আরো দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল : রামসত্য মুখোপাধ্যায়ের (১৯০৪) 'Indian Folklore' এবং কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৫) 'Popular Tales of Bengal' ইত্যাদি। তবে লালবিহারীর গ্রন্থের মতো এগুলি ততটা প্রসিদ্ধি পায় নি।

৪. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০১৪) : ন্যারেটলজি : ছোটোগল্প : ছোটোদের গল্প, কলকাতা : কোরক, পৃ ৩৩। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ঠাকুরমার ঝুলি' আখ্যানের সংগঠন নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন ফ্রাঁস ভট্টাচার্য।
দ্র. ফ্রাঁস ভট্টাচার্য (১৯৭৮) : ঠাকুরমার ও ঠাকুরদাদার ঝুলি : একটি পাঠ, পৃ. ১-২৭, এক্ষণ, ১৩ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা।

৫. R. Gargesh (1990) : Linguistic Perspective of Literary Style, Delhi : University of Delhi, p. 116.

৬. it, 116.

৭. পবিত্র সরকার (১৯৮৫) : গদ্যরীতি পদ্যরীতি, কলকাতা, সাহিত্যলোক।
পরেশচন্দ্র মজুমদার, অভিজিৎ মজুমদার (২০১০) : 'শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' : শৈলীগত অনুধাবন; অন্তর্গত : বাঙলা সাহিত্যপাঠ : শৈলীগত অনুধাবন', ২০১০, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২২১-২৪৩।

৮. G. Leech (1969) : A Linguistic Guide to English Poetry, London : Longman, p. 65.

৯. শিশিরকুমার দাশ (১৯৮৭) : কবিতার মিল ও অমিল, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

১০. চ্যাপমানের কথায় 'The word foregrounding is used to describe the kind of deviation which has the function of bringing some items into artistic emphasis so that it stands out from its surroundings.'
R. Chapman (1989) : Linguistics and Literature, London : Edward Arnold, p. 48.

১১. কোনো সন্দর্ভ/অধিবাচনে (discourse) দুটি এককে আমরা তখনই সংলগ্ন বলি, যখন একটির ব্যাখ্যানে অন্যটির ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। বলা বাহুল্য, এ ধরনের সম্পর্ক কোনো বয়ানের নিজস্ব বুনোট নির্মাণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। হ্যালিডে-হাসান (1990) সংলগ্নতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণের দিকে নজর করেছেন। যেমন, নির্দেশকতা (reference), বিকল্পন (substitution), অনুক্ত গঠন (ellipsis), শাব্দিক সম্পর্ক (lexical relation) প্রভৃতি।
দ্র. M.A.K. Halliday and R. Hasan (1990) : Cohesion in English, London and New York : Longman.

১২. D. Nunan (1993) : Introductding Discourse Analysis, London : Penguin, p. 117.

১৩. R. Chapman (1989) : Linguistics and Literature, London : Edward Arnold.

১৪. হ্যালিডে-হাসান (1976)-এর মতে ইংরেজি ভাষার সাপেক্ষে যৌক্তিক সম্পর্ক হতে পারে চার ধরনের—(i) সংযোজক (additive) : বাঙলায় 'আর', 'ও', 'এবং' প্রভৃতি সংযোজক দ্বারা চিহ্নিত; (ii) বিরোধমূলক (adversative) : 'কিন্তু', 'অথচ' ইত্যাদি সংযোজক দ্বারা চিহ্নিত; (iii) কালিক (temporal) : 'এরপর', 'তারপর', 'তখন', ইত্যাদি সংযোজকে চিহ্নিত, (iv) নিমিত্তসূচক (causal) : 'কারণ', 'কেননা' ইত্যাদি সংযোজক দ্বারা চিহ্নিত।
দ্র. M.A.K. Halliday and R. Hasan (1976) : Cohesion in English, London : Longman.

১৫. L. Bloomfield (1935) : Language, 1st Publ 1933, Great Britain : George Allen and Unwin Ltd.

১৬. দ্র. দিব্যজ্যোতি মজুমদার (১৯৯৩) : বাঙলা লোককথার টাইপ ও মৌটিফ ইনডেক্স, কলকাতা : অনুষ্টুপ।